ভ্রম

এম জে বাবু

অরণ্যমন প্রকাশনী

সকাল সকাল ঘুমটা ভাঙল চিৎকার-চ্যাঁচামেচি শুনে। প্রচণ্ড মাথাব্যথা করছে। মাথার দু'পাশ রয়ে রয়ে এমনভাবে ব্যথা করছে, যেন কেউ পেরেক ঢুকিয়ে দিয়েছে চোখের দু'পাশ দিয়ে। কম ঘুম হলে আমার মাথাব্যথা করে, সেজন্য ঘুম জিনিসটা খুব জরুরি আমার জন্য। নাহ্, আমার মাইগ্রেন নেই। তবে সাত থেকে দশ ঘণ্টা ঘুম না হলে নিজের মাথায় হাতুড়ি মারার শব্দ নিয়ে সারাদিন ঘুরে বেড়াতে হয় আমাকে। ভোঁ ভোঁ করে মাথা। কুম্ভকর্ণের ডিএনএ আর আমার ডিএনএ যদি পাশাপাশি রেখে বিশ্লেষণ করা যেত, দেখা যেত আমি কুম্ভকর্ণেরই বংশধর। কিঞ্চিৎ বেশিই ঘুমকাতুরে আমি। এই দৈনিক আট ঘণ্টার নিচে আমি ঘুমাই না। আট ঘণ্টা ঘুমিয়েও সারাদিন ঝিমাই, ক্লাসের শেষ বেঞ্চে, বাসের জানালার পাশের সিটে, কিংবা ভিসি চত্বরের লাল ইটের ওপরে।

হলে থেকে হিমুগিরি করে দেরিতে ঘুমানোর অভ্যেস করে ফেলেছি। কাল রাতও অভ্যাসবশত বিছানায় গিয়েছি দেরিতে। ঘুমিয়েছি প্রায় রাত তিনটায়। সারারাত পড়েছি অবশ্য। মাস্টার্সের ফাইনাল চলছে। ভালো করে পড়া হয়নি। ফেল করার প্রবল সম্ভাবনা দেখছি। সম্ভাবনা নয়, নিশ্চিত ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি। সেই ভবিষ্যতে হাবুডুবু খাওয়া থেকে বাঁচার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছি আজ কয়েক দিন যাবত। পাশ করার চান্স নেই বললেও চলে। মাস্টার্সে যেখানে সবার সিজিপি ৩.৫০-এর ওপর থাকে, সেখানে আমার পাশ করা নিয়ে টানাটানি। যদিও পাশ করি, সেকেন্ড ক্লাস উঠবে কি

না সন্দেহ আছে। আমার সুপারভাইজার এই নিয়ে অনেক টেনশনে আছেন। আর থাকবেন না'ই বা কেন? ছাত্র থিসিস খারাপ করলে অন্য ফ্যাকাল্টিরা তো তাঁকেই ধরবে।

এই নিয়ে আমার মাস্টার্সের চার বছর চলছে। বয়স আঠাশের মাথায়। মাথার কথা মনে পড়তেই টাকের কথা মনে পড়ে গেল। এ যেন মনে পড়ার ভেতর আবার নতুন কিছু মনে পড়া। ফ্রয়েডসাহেব কি এটা নিয়ে কোনো ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছেন? স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্ন থেকেও বেশি ইন্টারেস্টিং একটা স্মৃতি মনে করতে গিয়ে, সেই স্মৃতির মধ্যেই আর একটা স্মৃতির আবির্ভাব! নাহ্, মাথাব্যথা সঙ্গে করে এসব জটিল বিষয় নিয়ে ভাবা যায় না। সিগারেট আঙুলের ফাঁকে নিয়ে, চায়ে চুমুক দিয়ে পা নাড়িয়ে আয়েশ করার ভাবার বিষয় এসব।

কপালের দু'দিক থেকেই চুল উঠে গেছে আমার। এক ডাক্তার আপু বলল এটা নাকি অ্যান্ড্রোজেনিক অ্যালোপেশিয়া। আমার মাথা দেখে মনে হয় কোনো গোরু আমার চুলগুলিকে ঘাস মনে করে জিভ দিয়ে চেটে খেয়ে নিয়েছে। এই অদ্ভুত উপমাটা আমার ক্ষেত্রে খাটে একদম। আমার বাবা আমাকে গোরু ছাড়া আর কিছু মনেও করেন না। আজ বাবার সাথে দেখা হলে বলব আমাকে 'ঘাস' বলে ডাকতে। আমাকে গোরু ডাকা মানে গোরুর অপমান। গোরুও অনেক উপকারী। দুধ দেয়, বাচ্চা দেয়। আমি একদম বেকার— ঘাসের মতো; গোরু, গাধা, ঘোড়া ছাড়া কেউ খায় না। ঘাস বলে ডাকলে বরং আমাকে মানাবে। ঘাস যেমন পুষ্টিহীন, আমি তেমনই গুণহীন। ঘাস আর আমি ভাই ভাই। আমার বাবা আমার মস্তিষ্ক চিবিয়ে খান জাবর কেটে, ঠিক যেভাবে গোরু ধীরে ধীরে ঘাস খায়। সেই হিসেবে আমার বাবা আর গোরু ভাই ভাই। কোনো গোরুকে দেখলে এখন থেকে চাচা ডাকব।

এই চার বছরে আমার থিসিস কমপ্লিট করা হয়নি। প্রজেক্টের কাজ দেওয়ার জন্য আমাকে চাপাচাপি করেছিল সবাই, কিন্তু আমি নিইনি। সেটার ফল আমি পাচ্ছি এখন। স্যার আমাকে পাশ করানোর জন্য নিজে থিসিস করে দিয়েছেন। মনে হচ্ছে এবার পাশ করে যাব। পাশ করার পর কী করব তা নিয়ে কাল সারারাত ভেবেছি। প্রথমে মিষ্টি কিনব। সাধারণ মিষ্টি নয়, চমচম। কিনে বাবার সামনে এসে খাব। বাবার ডায়াবেটিস। বাবা মিষ্টি খেতে না পেরে অনুনয়-বিনয় করবেন একটা চমচম খাওয়ার জন্য। বাবার এই মরিয়া ভাব দেখে আমি শান্ত করব নিজেকে। বাবার খোঁটা শুনতে শুনতে আমার চামড়ায় ফুসকুড়ি পড়ে গেছে। জ্বলে গেছে কলিজার কিছু অংশ। এর প্রতিশোধ না নিলে আমিও শান্ত হব না।

আমার বাবার মাঝেমধ্যেই মর্নিং ওয়াকে যাওয়ার ইচ্ছা হয়। কিন্তু সেটা প্রতিদিন নয়, বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে। মুহূর্তটা তাঁর জন্য ভালো, বাকিদের জন্য খারাপ। বাবা কোর্ট-মার্শাল খাওয়া নেভি অফিসার। আমার শ্রদ্ধেয় দাদাজানের বিশাল সম্পত্তি আমার বাবা ব্যাবসায় খুইয়েছেন। তারপর আর কী, আমার মা সমস্ত দায়িত্ব ঘাড়ে নিলেন বিক্রমের মতো। স্কুলমাস্টারি করে সংসার চালিয়েছেন অনেকদিন। অবশ্য বাবা মাঝেমধ্যে কিছু করেন, যা করেন সেসব বুদ্ধিবৃত্তিক কাজের মধ্যে পড়ে। সে হিসেবে বাবা বুদ্ধিজীবী শ্রেণির মানুষ।

আমার বাবা এসব ছোটোখাটো কাজের জন্য জন্মাননি। দেশকে আলোকিত করার জন্য জন্মেছেন। তিনি দেশকে নানাভাবে আলোকিত করেছেন। যেমন আজকাল বাংলাদেশের ক্রিকেট খেলা নিয়ে বিশ্লেষণ করা শুরু করেছেন। আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই সেই বিশ্লেষণের রেজাল্ট পাওয়া যাবে।

আজ তাঁর মর্নিং ওয়াকে যাওয়ার ইচ্ছা হয়েছে বোধহয়। দরজায় ধপাস ধপাস মেরিন-কিল পড়ছে। বাবার সবকিছু আগেই 'মেরিন' শব্দটা উপাধি হিসেবে থাকে। যেমন, মেরিন-ধমক, মেরিন-হাসি, মেরিন স্টাইলে চুরুট টানা ইত্যাদি। এসব উপাধি আমার বড়োভাইয়ের দেওয়া। বাবা নেভি ছাড়ার সময় ভাইয়ার বয়স ছিল আট। আমি তখন ছোটো। বাবার সাথে ভালো স্মৃতির একমাত্র স্বত্ব আমার ভাইয়ার, আমার নয়। চাকরি ছাড়ার পর বাবা বেশ উগ্র হয়ে যান। বয়স বাড়ার সাথে সাথে তাঁর উগ্রতাও বেড়ে গেছে। সেটা চলেছে প্রায় বছর দশেক। তারপর উনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সবকিছুরই একটা সমাপ্তি থাকে; তাঁকেও শান্ত হয়ে সব মায়ের হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত। অতএব, সব ছেড়ে তিনি অবশেষে ব্যস্ত হলেন দেশসেবায়।

মাঝেমধ্যে বাবা সম্পর্কে অদ্ভুত কথা শুনি ভাইয়ার কাছে। যেমন বাবা নাকি মায়ের সাথে ঝগড়া করতেন তুমুল। কিন্তু মা'কে ছাড়া থাকতে পারতেন না। মা একবার বাবার সাথে ঝগড়া করে পাশের বাড়ি চলে যান। বাবা মা'কে আনতে যান। মা রাজি হচ্ছিলেন না। বাবা কোনো উপয়ান্তর না দেখে ভাইয়াকে তুলে নিয়ে যান মায়ের কাছে। মা ভেবেছিলেন তিনি হয়তো ভাইয়ার দোহাই দেবেন। আমি তখন মায়ের কোলে। কিন্তু বাবা ওই বাড়ির কিচেনে ছুটে যান। সেখান থেকে ফিরে আসেন রাগী চোখ দেখিয়ে, হাতে একটা বঁটি নিয়ে। সেটা ভাইয়ার গলায় ধরে বলেন, মা বাসায় না ফিরলে ভাইয়াকে খুন করবেন আগে, তারপর নিজেকে। মা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বাসায় ফেরেন। মায়ের প্রতি বাবার ভালোবাসা সম্ভবত অনেক। এজন্যই মা'কে ছাড়া তিনি কিছু ভাবতে পারেন না। এই বুড়ো বয়সেও মা'কে কিছুক্ষণ না দেখলে পুরো বাড়িময় চেঁচিয়ে বেড়ান তিনি।

বাবার ধৈর্য কম। সেজন্য হয়তো তিনি কোনো পেশায় স্থায়ী হতে পারেননি। দরজা না খোলা পর্যন্ত এই মেরিন-কিল চলতে থাকবে। নেভিতে বাবা কতটা অধ্যবসায়ী ছিলেন তা জানি না, কিন্তু দরজায় নক করার ব্যাপারে বাবা খুব অধ্যবসায়ী। দরজায় নক করার সঙ্গে সঙ্গে বাবা আবার ওপাশ থেকে বলছেন, "এই ওঠ! সকাল ছয়টা বাজে, আর কত ঘুমাবি!"

'ধুপ ধুপ ধপাস' স্টাইলে বাবা নক করছেন। দরজা নক করারও বিশেষ তাল আছে। দরজায় নক করার পদ্ধতি শুনেই বুঝতে পারা যায় দরজার ওপাশে কে আছে। বাড়িতে থাকলেই এই নকের শব্দ শুনে আমার ঘুম ভাঙে। কোনোদিন যদি বাবা আমাকে তুলতে ভুলে যান, আমি দুঃস্বপ্ন দেখে উঠে যাই। সেই দুঃস্বপ্ন হয় বাবার দরজায় নক করা থেকেও ভয়ংকর কিছু। সেদিকে বরং আর না'ই বা গেলাম। এমনিতেই বেশি কিছু বলে ফেলেছি।

বাবা অনেকক্ষণ যাবত নক করছেন। একটু পর খোঁটা দিতে শুরু করবেন। সুর ধরে খোঁটা দেবেন। গান পর্যায়ের খোঁটা যেটাকে বলা চলে। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ-এর মতো লম্বা রাগ টান দিয়ে খোঁটা দেবেন। প্রত্যেক খোঁটার বিনিময়ে আমার মনে ফুসকুড়ি পড়ে। তাঁর এই আর্টটাকে বিশেষ সম্মান দিতে বরাবর আমি মা'কে বলে যাই। মা মুখ টিপে হেসে ব্যাপারটা চেপে যান। তিনি তাঁর স্বামীকে কোনোদিন মুখ শক্ত করে কিছু বলেন না। এত অত্যাচার সহ্য করেও বাবার প্রতি তাঁর অগাধ ভালোবাসার কারণটা আমি কোনোদিন বের করতে পারিনি।

ভালোবাসার থেকে বেশি জটিল হল সম্পর্ক। ঘৃণার সম্পর্কও টিকে থাকে। বরং ভালোবাসার সম্পর্ক থেকে বেশি টিকে থাকে। ভালোবাসার মানুষটাকে কেউ ভালোবাসার জন্য

মনে রাখে না। বিচ্ছেদ হওয়ার পর বুকে একরাশ তীব্র ব্যথা আর ঘৃণা নিয়ে মনে রাখে জীবনভর। ঘৃণার সৌন্দর্য হয়তো এটাই। বাবা একমাত্র অধ্যবসায় আমাকে বিরক্ত করার ক্ষেত্রেই। মাঝেমধ্যে ভাবি, তিনি আমাকে এত ভালোবাসেন কেন? যা অন্য কারও সাথে করেন না, তা আমার সাথে করেন কেন?

রাজস্থানের কোনো এক এলাকায় কেউ যদি মারা যায়, তাহলে কান্না করার জন্য ভাড়া করে লোক নিয়ে যায়। তাদের বলে 'রুদালি', বাংলাতে কাঁদুনি। এটা ওদের প্রফেশন। আমার বাবাকেও খোঁটা, খোঁচা, অপমান করার জন্য ভাড়া নেওয়া উচিত। তাঁর থেকে না কেউ ভালো অপমান করতে পারেন, না পারবেন।

বাবার খুব রাগ। তবে তিনি রগচটা কিংবা বদমেজাজি নন। একদম খাঁটি একটা রাগী মানুষ। রাগের বশবর্তী হয়ে কী না কী করে ফেলবেন সেটার ঠিক নেই। আমার উঠে যাওয়া দরকার। কিন্তু এখন উঠব না। উঠলেই অনেক কথা শুনতে হবে। তার চেয়ে বরং বাবার নক-নকানির গান আরও কিছুক্ষণ শোনা যাক। এখন এককাপ চা'ও কপালে জুটবে না। তার থেকে বরং বাবা দরজায় নক করতে থাকুন। তার আওয়াজ শুনে সবাই ঘুম থেকে জাগুক আগে। বাবাকে মা এসে বলুন কিছু। তারপর এককাপ খেয়ে আরামসে দিন শুরু করব।

"কুম্ভকর্ণ নাকি তুই? ওঠ! নাহলে এখনই দরজা ভেঙে ফেলব!" বাবা তাঁর মেরিন স্টাইলে বললেন।

না, আর বিছানায় ঘাপটি মেরে বসে থাকা শ্রেয় হবে না। বাবার রাগের ঠিক নেই। সত্যি সত্যিই না দরজা ভেঙে ফেলেন! দরজা ভাঙবেন তো ভাঙবেনই, আমাকে সহ ভেঙে দেবেন। ছোটোবেলা মেরে আমার বাম হাতটা ভেঙে দিয়েছিলেন

একবার। সেটাও বেশ ছোটো অপরাধে। বাবার পকেট থেকে দুই টাকা চুরি করে আইসক্রিম খাওয়ার দায়ে। তাঁর শাস্তির ভয়ে আজ অবধি বাড়ির কেউ তাঁর সাথে জোরগলায় কথা বলে না। জঙ্গল থাকুক আর না থাকুক, সিংহ জঙ্গলের রাজা। বাবাও ঠিক এরকম। আমাদের ঘরের রাজা তিনিই। তাঁর কথাই শেষ কথা।

দরজা খুলে দেখলাম বাবা দাঁড়িয়ে আছেন। পরনে সাদা পাঞ্জাবি। আমার বাবার বয়স বাষট্টি। এই বয়সের মানুষের সামনের চুল পড়ে যাওয়ার কথা; চুলে পাক ধরার কথা; টেনশন হলে টাকে হাত বুলানোর কথা; মুখ কালো করে দীর্ঘশ্বাস ফেলার কথা; কিন্তু তার কোনোটাই হচ্ছে না। না চুল পাকছে, না চুল ঝরছে। মাঝেমধ্যে ইচ্ছে করে বাবাকে ন্যাড়া করে দিই, পেছনের চুলগুলো সাদা করে দিই। তাহলে বোধহয় বাবাকে বাবা টাইপের মনে হবে।

বাবা আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখলেন। চোখে বিরক্তি জমছে তাঁর। আস্তে আস্তে বিন্দু বিন্দু করে বিরক্তি জমে তা মহাসাগরে রূপান্তরিত হবে। বিরক্তি চোখের সীমানা পার করে প্রথমে নাকে আসবে, তারপর মুখে। তারপর বাবা আমার ওপর ভেঙে পড়বেন। ভেসে যাব আমি তাঁর বিরক্তির প্লাবনে।

"তুই কি আমার ছেলে?" বাবা বললেন।

বাবার মুখে এই প্রশ্নটা যতবার শুনেছি সেটার যদি হিসাব করতাম তাহলে এতদিনে একটা গিলগামেশ হয়ে যেত। গিলগামেশে যেখানে রাজা গিলগামেশের রাজত্বে উরুকের বাসিন্দাদের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছে সেখানে আমার লেখা 'বাবাগামেশ'-এ বাবার অত্যাচার তুলে ধরতাম। এক-দুই হাজার বছর কোনো এক জাদুঘরে থাকত আমার কাব্য। হাজার হাজার পাঠক পড়ে শিহরিত হয়ে উঠত। সেই জ্ঞান